একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Nature in the Poetry of Prasannamayi Devi and Mrinalini Sen, Two Forgotten Women Poets of the 19th century

উনিশ শতকের বিস্মৃত দুই নারী কবি প্রসন্নময়ী দেবী ও মৃণালিনী সেনের কবিতায় প্রকৃতি

Name of the Author: DR. RANJAN NAYAK

Affiliation: SACT-I — BEJOY NARAYAN MAHAVIDYALAYA

ITACHUNA, HOOGHLY, W.B., INDIA, 712147

Abstract: The expression of nature-consciousness in literature is an important theme. The beauty, charm, fragrance, and diversity of nature evoke various emotions in the creator's heart. These emotions, infused with poetic imagination, eventually assume the form of poetry. Although nature appeared in ancient and medieval Bengali literature, its treatment was largely conventional. It was used mainly as a backdrop rather than as an independent subject. In the continuous stream of Bengali literature, the nineteenth century marks a significant phase. During this period, the Bengali mind and intellect awakened through contact with Western education, culture, and literature. A new light entered the literary world. Themes such as nature, love, and society began to acquire distinct and independent characteristics. In this era, literary pursuits were not dominated solely by male poets and writers; women poets and authors also demonstrated nearly equal proficiency. From the middle of the nineteenth century, a considerable number of women poets and writers emerged in the realm of Bengali literary culture. Among them, the poets Prasannamayee Devi and Mrinalini Sen were particularly noteworthy. Although both poets were once widely admired, they are now largely unfamiliar to contemporary readers. In their poetic world, themes such as love, domestic life, grief and melancholy, social concerns and women's issues, spiritual experience, and patriotic sentiment are vividly reflected. Yet nature remained one of their most significant subjects. Like many other women poets of the nineteenth century, they regarded nature as an inseparable part of their lives. Within the tender, affectionate, and soothing aspects of nature they sought refuge, while its harsh and severe manifestations often filled them with fear and anxiety.

Keywords: Nineteenth century, women poets, natural landscape, affectionate, imagination, refuge, love, melancholy, moonlight, birdsong.

উনিশ শতকের বিস্মৃত দুই নারী কবি প্রসন্নময়ী দেবী ও মৃণালিনী সেনের কবিতায় প্রকৃতি

ড. রঞ্জন নায়ক

"নিশার মৃদুল বায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
বহিতে লাগিল অঙ্গ শীতল করিয়া,
কাতর চঞ্চল আঁখি,
নীলাম্বরে স্থির রাখি,
নিশীথ-নক্ষত্র-শোভা করি দরশন,
বিষাদের চিন্তা কিছু ভুলিনু তখন।"[১]

– প্রসন্নময়ী দেবী

আবহমান বাংলা সাহিত্য প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতির নানা রূপ-রস-বৈচিত্র্য স্রষ্টার হৃদয়ে নানা ভাবের জন্ম দেয়, আর সেই ভাব থেকে বেরিয়ে আসে কবিতা । প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত গতানুগতিক। কেবল কবিতার পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে সেখানে প্রকৃতিকে আনয়ন করা হয়েছে । আধুনিকযুগে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় প্রথম নিসর্গ প্রকৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে। "বর্ষায়, শরতে, শীতে, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, বসন্তে নিসর্গের বিচিত্র রূপ বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।"[২] তবে নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের এমন কোনো বিশ্লেষণী মানসিকতা বা বিশেষ চেতনা ছিল না যে , যার মধ্য দিয়ে কবি আত্মলীন হতে পারতেন। আংশিক হলেও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মলীন হওয়ার প্রথম পরিচয় আমরা পেলাম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে । তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে সেই ছাপ স্পষ্ট । পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র ও 'ভোরের পাখী' বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে নিসর্গ -প্রকৃতি প্রাণময়ী সত্তায় পরিণত হয়।

উনিশ শতকের মহিলা কবিদের কবিতায়ও প্রকৃতির অমোঘ অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । তাঁদের কবিতায় প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ চোখে পড়ে। কেউ কেউ নিজের একান্ত আবেগ অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন , আবার কেউ কেউ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন । কারও কাছে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে বিশ্বপ্রাণের শক্তি , কারও কাছে সংহাররূপী রুদ্রাণী। "প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে নারী -গীতিকবি তাঁর আবেগ উজাড় করে দিয়েছেন, সঙ্গে যোগ করেছেন তাঁদের বলার ভঙ্গীর নিজস্বতাটুকু।"[৩]

মহিলা কবিদের কবিতায় প্রকৃতিভাবনা বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায় প্রমুখ খ্যাতনামা মহিলা কবির পাশাপাশি প্রসন্নময়ী দেবী এবং মৃণালিনী সেনের নাম স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে। উনিশ শতকের মহিলা কবি-সমাজে প্রসন্নময়ী দেবী এবং তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবী— দু'জনেই কবিরূপে ছিলেন যশস্বিনী। কিন্তু কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম আমাদের

কাছে যত না পরিচিত ঠিক ততটাই অপরিচিত তাঁর মাতা **প্রসন্নময়ী দেবী** (১৮৫৭ – ১৯৩৯)। অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার বংশের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন তাঁর পিতা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী ও ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর অগ্রজা প্রসন্নময়ী দেবীর মাত্র দশ বছর বয়সে কৃষ্ণকুমার বাগচি'র সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু বৈবাহিক জীবন সুখের হয়নি। বিবাহের মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে তাঁর স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর জীবনে নেমে আসে যন্ত্রণাময় বিষাদের ঘন মেঘ। ব্যক্তিজীবনের বহু প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছেন। শুধু কবিতা নয়, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি ইত্যাদি রচনাতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। বালিকা বয়স থেকেই তিনি কাব্যানুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁর রচিত কাব্যগুলি হল— 'আধ-আধ-ভাষিণী' (১৮৭০), 'বনলতা' (১৮৮০), 'নীহারিকা' (১ম ভাগ– ১৮৮৪, ২য় ভাগ– ১৮৯৬)।

প্রসন্নময়ীর কবিতায় স্বদেশপ্রেম, সামাজিক চেতনা, নারীর মঙ্গলবিধান ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র ১২বছর বয়সে লেখা 'আধ-আধ-ভাষিণী' কাব্যেই তাঁর প্রকৃতিপ্রেম ফুটে ওঠার পরিচয় পাই। 'বসন্ত বর্ণন' কবিতায় আমরা দেখি শীতের অন্তিম প্রহরে বসন্তের আগমনে প্রকৃতির চিত্র পরিবর্তনকে। প্রাণহীন রুক্ষ প্রকৃতি বসন্তে সজীব হয়ে ওঠে। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তার সমস্ত শরীর। মলয় বাতাস বইতে থাকে। কোকিলের কলতান প্রকৃতির সেই আনন্দময় রূপকে আরও ঘনীভূত করে তোলে,—

"শীত ঋতু করে শেষ বসন্ত আইল।
হায় কি সুন্দর সাজে ধরণী সাজিল।।
প্রকৃতি প্রকৃত বেশ ধরিল এখন।
হেরিয়ে প্রফুল্ল হলো ভাবুকের মন।।
কোকিল আইল দেখ বসন্তের সাথে।
ভূলোক পুলক হলো সুখের আশাতে।।"[৪]

তাঁর পরবর্তী কাব্য 'বনলতা'য় প্রকৃতি উঠে এসেছে কবির স্মৃতি মন্থনের মাধ্যমে। প্রসন্নময়ী দেবী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বিষাদ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট এক কবিপ্রাণ। জীবনে সুখের অনুভূতি পেতে তিনি কখনও অতীত শৈশব স্মৃতিতে ডুব দিয়েছেন কখনও বা কল্পনায় সুখ-স্বপ্নে সুখী হতে চেয়েছেন। শৈশবের কাটানো মুহূর্তগুলি তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাটানো দিনগুলি তাই তাঁর কবিতায় ভিড় করে। 'সেই দিন' কবিতায় দেখব কবি শৈশবের সেই অকৃত্রিম সুখের দিনগুলো খুঁজেছেন। তিনি বলেন—

"সুচারু কিরণ-জালে মণ্ডিত গগন;
রূপসী রজনী সতী,
রূপবতী বসুমতী,
রূপের তরঙ্গময় সকল ভুবন।

প্রকৃতির ফুল্লমূর্ত্তি করি বিলোকন,
মাতিল শৈশব প্রাণ,
আনন্দে হারানু জ্ঞান,
বিমল আনন্দে বুক ভরিল তখন।”[৫]

ঠিক অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায় ‘কেন জাগিলাম’ কবিতায়। এখানে কবি স্মৃতি-স্বপ্নে ডুব দিয়েছেন। জীবনে ফেলে আসা স্মৃতির ভীষণ তরঙ্গে হঠাৎ কবির ঘুম ভাঙে। তিনি জেগে উঠে প্রাঙ্গণে বসেন এবং দেখতে থাকেন রাত্রির শান্ত প্রকৃতির সুন্দর শোভা।

“নীরবে ক্ষণেক বসি ধবল প্রাঙ্গণে,
প্রকৃতির শুভ্র শোভা হেরিনু নয়নে,
নীরবে সমীর বয়,
উদ্যান-কুসুম-চয়,
চুম্বিয়া, সৌরভ মাখি পুলকে মাতিয়া,
খেলিছে তাদের সনে লহরী তুলিয়া।”[৬]

কবির বিষাদময় জীবনে সজীব প্রকৃতির যে কয়েকটি উপাদান কবিকে শান্তি দিয়েছিল তার একটি হল পাখির কলতান। ‘গাওরে আবার’ কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় সেই কলতানে বিভোর কবিকে। পবিত্র শিশুর মতো পাখির মিষ্টি ডাক কবির শুষ্ক হৃদয়ে শান্তির বারি বর্ষণ করে। তাই প্রিয় বিহগিনীকে উদ্দেশ্য করে বারে বারে তিনি গাইতে বলেন—

“তুমি গাওরে আবার
প্রিয় বিহগী আমার
সুধা কণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া,
বসুমতী কাঁপাইয়া
পরশিবে নীলিমায় তোমার সুস্বর,
জাগিবে শশাঙ্ক সহ তারকা নিকর।”[৭]

বীণার সঙ্গীতের মতো এই গান প্রত্যহ শুনতে শুনতে কবি নিজেকেই ভুলে যান। ভুলে যান জীবনের ব্যর্থতা, বিষন্নতাকে। কবি বলেন—

“বীণার সঙ্গীতসম
ও বচন নিরুপম,
যেদিকে শ্রবণ পাতি শ্রবণ ভরিয়া
শুনি নিত্য তব কণ্ঠ আপন ভুলিয়া।”[৮]

প্রসন্নময়ী দেবীর একটি বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা হল 'জীবন্ত কাব্য'। কবির কল্পনায় বিভিন্ন ভাবরাশি সুসংহতভাবে সজ্জিত হয়ে যেভাবে কাব্য তৈরি হয় ঠিক তেমনিই কাব্যের আকারে প্রকৃতি সেজে উঠেছে। প্রকৃতির এই সুন্দর কাব্যময় রূপ দেখে কবি বলেন—

"তুষার ভূষিত শির,
হিমাদ্রি অচল স্থির,
প্রভাত অরুণকর তরল কাঞ্চন
বর্ষে যবে, সেই শির করিয়া শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে শোভা
কম্পিত সুবর্ণ বিভা,
অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নয়ন রঞ্জন—
দেখিয়াছি, দেখি নাই কবিত্ব এমন।"[৯]

প্রকৃতির নিছক শোভা বর্ণন নয়, ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন কবিতায় কবি প্রকৃতিকে বিচিত্রভাবে তুলে ধরেছেন। যবন সেনার সঙ্গে দেওয়ারের বীর শ্রেষ্ঠ প্রতাপ সিংহের যে যুদ্ধ হয় তাকে অবলম্বন করে রচিত 'স্মৃতি-রেখা' কবিতায় কবি যুদ্ধ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকৃতির যে রূপ অঙ্কন করেছেন তা অনবদ্য—

"গভীর গম্ভীর তামসী নিশি,
আঁধার গগন আঁধার দিশি,
বিলুপ্ত সুষুপ্ত তারকা রাশি,
মেঘ পড়ে মেঘ চলিছে ভাসি।
... ...
উঠিল পবন চলিল বহি
মাতিল পবন কাঁপিল মহী,
বাধিল তুমুল ভৌতিক রণ
আলোড়ি সাগর পর্ব্বত বন।"[১০]

প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন বহুভাষা-জ্ঞানী একজন স্রষ্টা। তিনি অনেকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত কবিতায়ও প্রকৃতির প্রতি কবির অনুভূতি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রোমান্টিক কবি Shelly এর 'Address to the moon' অবলম্বনে রচিত 'হে চন্দ্র' কবিতায় তিনি আকাশে থাকা চাঁদের রূপটি তুলে ধরেছেন।

"সুদূর গগনে থাকি,
ধরণীতে নেত্র রাখি,
ক্লান্তিতে কি পাংশুবর্ণ বদন তোমার?

ভ্রমিতেছ দিন দিন,
সদা সহচর হীন
বিভিন্ন প্রকৃতি যত তারকা মাঝার।”[১১]

উপরে আলোচিত প্রসন্নময়ী দেবীর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি ছাড়াও ‘বনলতা’ কব্যের ‘কি সুখ আমার’, ‘সেই দিন’ ‘কোকিলের প্রতি’, ‘কি দেখিলাম’, ‘একটি নক্ষত্র’, ‘পবিত্র কুসুম’ ‘বিশুষ্ক কমল’ ‘কেন কাঁদি’ ‘একটি প্রার্থনা’ এবং ‘নীহারিকা’ কাব্যের ‘সেই চন্দ্রালোকে’, ‘প্রিয় ফুল’, ‘সাধ পুরিল না’, ‘উদাসীন’, ‘অভাগিনী’, ‘জীবন কাহিনী’, ‘সঙ্গীত’, ‘প্রকৃতি প্রণয়ী’ ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতি নানা রূপে নানা ভাবে ফুটে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত অন্যতম মহিলা কবি হলেন **মৃণালিনী সেন** (১৮৭৯ – ১৯৭২) । বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মৃণালিনী জন্মগতভাবে বাঙালির কন্যা হলেও বাংলার কন্যা ছিলেন না। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা বিহারের ভাগলপুরে। তাঁর পিতা ছিলেন লাডলিমোহন ঘোষ। উনিশ শতকের অপরাপর মহিলা কবিদের মতোই মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কলকাতার পাইক পাড়া অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত জমিদার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে। কিন্তু সেই দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে তিনি বিধবা হন। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ সম্পন্ন হয়। বৈচিত্র্যময় ব্যক্তি জীবনের একটি অংশে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা ও কঠিন সমাজবিধানে আবদ্ধ থেকে কবির মনোবীণায় যে সুর সবসময় বেজে উঠত তারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— ‘প্রতিধ্বনি’ (১৮৯৪), ‘নির্ঝরণী’ (১৮৯৫), ‘কল্লোলিনী’ (১৮৯৬), ‘মনোবীণা’ (১৯০০)। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পূর্বে তাঁর জীবন ছিল দুর্বিষহ যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। তাই দুঃখের সুর ধ্বনিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তার পাশাপাশি তাঁর কবিতায় ঈশ্বর অনুভূতি, স্বজাতি বোধ, সামাজিক চেতনা এবং নির্মল প্রকৃতির মায়াঘন রূপও প্রকাশ পেয়েছে।

নিতান্তই সহজ সরল আটপৌরে ভাষায় রচিত তাঁর ‘পল্লীগ্রামে প্রভাত’ নামক কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। এখানে কবি পল্লিবাংলার সকালবেলার শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাতের শেষে সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে পাখির কলতানের সঙ্গে প্রভাত আসে—

“রাত পোহাল, প্রভাত হ’ল,
ঊষা-সতী এল।
চাঁদের আলো নিবিয়ে গেল,
আকাশ উজল হ’ল।
... ...
পাখী সকল করে কল্ কল্
ঊষার সাড়া পেয়ে,

হরষ ভোরে বেড়ায় উড়ে,
নীল গগনের গায়ে।”[১২]

তারপর কবি একে একে ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রাম-বাংলার কর্মচঞ্চল রূপ। দিনের শুরুতে বাড়ির উঠোনগুলিতে গোবর-জল পড়েছে। কেউ কেউ পুকুর পাড়ে বসে রাতের এঁটো বাসন মাজছে, আবার কেউ কেউ কলসী কাঁখে নিয়ে গল্প করতে করতে জল আনতে যাচ্ছে—

“সব বাড়ীতে, উঠোনেতে
গোবর-জল পড়ে।
কেউ বা মাজে রাতের বাসন,
পুকুরের পাড়ে।”[১৩]

কৃষক ফসলের আশায় গোরু আর লাঙ্গল নিয়ে মাঠের দিকে যায়। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমি করতে করতে পাঠশালায় ছুটে। ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে তার উজ্জ্বল আভা নিয়ে। প্রকৃতির এই শোভা কবির বর্ণনায় অপরূপ হয়ে ওঠে—

“পূব আকাশে, সূর্য্যি ভাসে,
সোণার থালার মত।
রূপের প্রভায়, জগৎ মাতায়,
দিক্ উজলায় যত।”[১৪]

যুগ যুগ ধরে চাঁদের জ্যোৎস্না কবিমনকে বিভিন্নভাবে নাড়া দিয়েছে। বহু স্রষ্টা তাঁদের সৃষ্টিতে চাঁদের রূপ বিচিত্রভাবে অঙ্কন করেছেন। কবি মৃণালিনী দেবীও চাঁদের এই মায়াবী রূপে মুগ্ধ। তাঁর বহু কবিতায় এই জ্যোৎস্নার হাসিভরা রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বাল্যনিরবধি জ্যোৎস্নার অপরূপ রূপ দর্শন করেও কবির হৃদয় তৃপ্ত হয়নি। তাই রোমান্টিক কবিদের মতো তিনি বলেন—

“মধুরতাময়ী অয়ি জ্যোৎস্না-সুন্দরী!
ছড়াও বিমল বিভা কি সুন্দর মরি!
দেখিয়ে অতৃপ্ত,— সাধ জ্যোছনা আসিয়া
করি পান, মাখি বুকে ছানিয়া ছানিয়া।”[১৫]

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের সহজেই মনে আসে ‘রূপসী বাংলা’র কবি জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কাব্যের ‘ঘাস’ কবিতাটির কথা। সেখানেও প্রকৃতিপ্রেমিক এক অতৃপ্ত রোমান্টিক কবির এরূপ প্রকৃতি সম্ভোগের চিত্র ফুটে উঠেছে সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ নেওয়ার প্রসঙ্গে। তিনি বলেন—

“আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাশে গেলাশে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,”[১৬]

প্রেম, প্রকৃতি ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রকৃতির মাঝখানে প্রেমের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মৃণালিনী সেন তাঁর 'প্রণয়ী যুগল' কবিতায় প্রেমভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করেছেন।

"নিঝুম চারি ধার, কোন শব্দ নাই আর,
শুধুমাত্র ঝিল্লী-রব শ্রবণেতে পশিছে।
শুক্লপক্ষ প্রতিপদ, অন্ধকার জনপদ,
অন্ধকারে নয়নের দৃষ্টি রোধ হয়েছে।"[১৭]

প্রকৃতপক্ষে কঠিন সামাজিক অনুশাসনে জর্জরিত উনিশ শতকের মহিলা কবির কাছে প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটানো মোটেই সহজ ছিল না। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রকৃতির আড়ালে নিজেদের মনের কোণে জমে থাকা অব্যক্ত অনুভূতিকে প্রকাশ করতেন।

শুধু প্রেম নয়, বিষাদময় ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণাও কবি মৃণালিনী সেন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'বরিষা হৃদয়' কবিতায় আমরা দেখি প্রকৃতির বিষন্ন রূপ কবির বিষাদময় জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। তাই প্রকৃতির মাঝে নিজের প্রতিবিম্বকে খুঁজে পেয়ে কবি বিষণ্ণা প্রকৃতিকে প্রশ্ন করেন—

"প্রকৃতি আমারি মত তোমারো আজিকে
কেন মুখ ম্লান?
... ...
ভগ্নস্বরে কেঁদে কেঁদে বায়ু বহে যায়
হইয়া আকুল;
পাখীরা গাইছে গান,
তুলিয়া করুণ তান,
কাঁদিতেছে তরুলতা,— ম্রিয়মান ফুল।"[১৮]

কবির বিশ্বাস সঙ্গিনী প্রকৃতি ছাড়া কবির হৃদয়ের এই যাতনা কেউ বুঝতে পারবে না। তাই কবির কাছে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে সান্ত্বনার আশ্রয়। যার অশ্রুধারা কবির ঊষর ব্যথিত হৃদয়ে বর্ষার ধারার মতো ঝরে পড়বে।

উনিশ শতকীয় সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর মনোভাবনা ব্যক্ত করার মতো কোনো জায়গা ছিল না। অধিকাংশই নিজেদের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগগুলোকে নিজেদের বুকের মধ্যে চেপে রেখে পাষাণ হয়ে যেত; নতুবা কেউ কেউ ছন্দোময় কবিতায় না বলা কথাগুলোকে প্রকাশ করে হৃদয়ভার হালকা করত। তাই তাঁদের কাছে কবিতা ছিল হৃদয়ের রানি, যেখানে তাঁরা এই পুরুষশাসিত সমাজ-সংসার ভুলে এক হতে পারত। এই কবিতা তাঁদের হৃদয়ে কীভাবে জেগে উঠত তা বলতে গিয়ে কবি প্রকৃতির স্মরণাপন্ন হয়েছেন। তিনি বলেন–

"নীল সিন্ধু-নীরে যেন সোনার কমল

পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বদিকে হাসি মেলে আঁখি;
রূপের জ্যোতিতে দশ দিক্ ঝলমল,
সহসা আগুন যেন উঠিয়াছে লাগি! —
উদিয়া কখন্ একে একে তারারাশি
সে আলোক-সর-মাঝে ত্যজে নিজ কায়;
শুধু দু চারিটী, ক্ষীণ ম্লান হাসি হাসি'
প্রাণপণে আপনারে ফুটাইতে চায়।"[১৯]

প্রকৃতির কেবল স্নিগ্ধ কোমল রূপ নয়, তার অসহনীয় রূপও তিনি প্রকাশ করেছেন অনেক কবিতায়। 'নিদাঘ-মধ্যাহ্নে চাতক পক্ষী' কবিতায় গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ট ধরণীর রূপ প্রকাশ পেয়েছে—

"প্রচণ্ড নিদাঘ দ্বিপ্রহর!
রবি-রশ্মি জ্বালাময়,
অবিষহ্য অতিশয়,
তপ্ত দেহ, তাপিত অন্তর!
আকাশ-নীলিমা হায়!
পুড়িয়া অঙ্গার প্রায়,
চাহিলে ঝলসি' যায় চোখ!"[২০]

উপরে আলোচিত কবিতাগুলি ছাড়াও মৃণালিনী সেনের 'প্রতিধ্বনি' কাব্যের 'বসন্ত পূর্ণিমা', 'সঙ্গিনী', 'বাঁশি', 'অকূল সমুদ্র' 'প্রভাতে প্রকৃতি', 'কখন বসন্ত এলো', 'প্রকৃতি ও হৃদয়', নক্ষত্র', যমুনা-জাহ্নবী, ইত্যাদি। 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'সুখতারা', 'বিটপী বিচ্যুতা বিশুষ্ক ব্রততী', 'বসন্তে', এবং 'মনোবীণা' কাব্যের 'বালিকা ও বিহঙ্গম' ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আভাসিত হয়েছে।

বস্তুত প্রসন্নময়ী দেবী ও মৃণালিনী সেনের কবিতায় প্রকৃতি কেবল বর্ণনাময় বাহ্যিক রূপে প্রকাশ পায়নি, বরং তা তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাঁদের কাব্যচর্চার একটি দিক হিসাবে প্রকৃতিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলেও পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতায় প্রকৃতি এসেছে হাত ধরা ধরি করে। কখনও প্রেমের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রকৃতির মায়াময় রূপ যেমন মাধ্যম হয়েছে, তেমনি আবার গৃহস্থলীর নানা প্রসঙ্গ প্রকৃতির আবহে ফুটে উঠেছে। আবার কখনওবা ধর্মপ্রাণা বাঙালি নারীর হৃদয়ে পরমেশ্বরের অনুভূতি প্রকৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। দেবী, প্রসন্নময়ী/ বনলতা/ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রকাশিত/ ১২৮৭ সাল/ পৃষ্ঠা— ১০৩
২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার/ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা— ৭৩/ প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৭/ পৃষ্ঠা— ১৮১
৩। দে, গোপা/ উনিশ শতকের তিন নারী কবি/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা— ৭৩/ প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১০/ পৃষ্ঠা— ১৯০

৪। রায়, অলোক (সম্পাদিত)/ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বঙ্গের মহিলা কবি/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা— ৭৩/ দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৫৩/ পৃষ্ঠা— ৬১
৫। দেবী, প্রসন্নময়ী/ বনলতা/ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রকাশিত/ ১২৮৭ সাল/ পৃষ্ঠা— ১৪
৬। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ২১
৭। দেবী, প্রসন্নময়ী ('বনলতা' রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত)/ নীহারিকা/ এস্ কে লাহিড়ী কোং দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার/ ১২৯০ সন/ পৃষ্ঠা— ২৩
৮। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ২৮
৯। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ২৯
১০। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ৩৬- ৩৭
১১। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ৪৭
১২। মৃণালিনী, শ্রীমতী প্রণীত/ প্রতিধ্বনি/ ১ নং হেরিংটন স্ট্রিট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা/প্রকাশ, ১৩০১/ পৃষ্ঠা— ৮২
১৩। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ৮৩
১৪। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ৮৩
১৫। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ৮৮
১৬। বসু, বুদ্ধদেব (সম্পাদিত)/ আধুনিক বাংলা কবিতা/ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ/ কলকাতা— ৭৩/ পুণর্মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৮
১৭। মৃণালিনী, শ্রীমতী প্রণীত/ প্রতিধ্বনি/ ১ নং হেরিংটন স্ট্রিট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা/প্রকাশ, ১৩০১/ পৃষ্ঠা— ১৩৬
১৮। মৃণালিনী, শ্রীমতী প্রণীত/ নির্ঝরিণী/ ১ নং হেরিংটন স্ট্রিট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা/ প্রকাশ, ১৩০২/ পৃষ্ঠা— ১০- ১১
১৯। মৃণালিনী, শ্রীমতী প্রণীত/ মনোবীণা/ বি. কে চক্রবর্তী অ্যান্ড ব্রাদ্রার্স, কলকাতা/ প্রকাশ ১৯০০/ পৃষ্ঠা— ৫৮
২০। তত্রৈব, পৃষ্ঠা— ৩৩